78

১৬/১১/২০০০
পৃঃ ১১ কঃ ৩

দৈনিক ইনকিলাব

অথর্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ডুবন্ত বাংলাদেশ

ফিরোজ মাহবুব কামাল

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যে কতটা ব্যর্থ ও অকার্যকর সেটির প্রমাণ শিক্ষা বোর্ডসমূহ নিজেই পেশ করেছে। প্রমাণ, এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় শতকরা ৬৩ জনের ফেল। এ ব্যর্থতা কি পরীক্ষার্থীদের? ট্রেন যদি তার লক্ষ্যে না পৌছে সে জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই [illegible] ছিল [illegible] মাত্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকগণ তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছায়নি। নিজ কলেজের ফলাফল অন্য কলেজের চেয়ে ভাল দেখানোর লক্ষ্যে বহু কলেজ কর্তৃপক্ষ আজকাল নকলের সুযোগ করে দেয়। ফলে বিলুপ্ত হয়েছে পড়াশোনার গুরুত্ব। এভাবে পাসের হার বাড়িয়ে ধোঁকা দিয়েছে অভিভাবকদের। কিন্তু পচন এখন এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, নকলেও আর পাস জুটছে না। বই দেখে নকলেও ন্যূনতম যোগ্যতা লাগে। কিন্তু এ শিক্ষায় সেটিও গড়ে উঠছে না। যারা ফেল করেছে তাদের কেউ অন্ধ, বধির বা মেধাশূন্য ছিল না। জ্ঞান আহরণে তাদের আগ্রহ ছিল না সেটিও নয়। আগ্রহ না থাকলে তারা সেখানে যাবেই বা কেন? অর্থ ও কালক্ষেপণের উপযুক্ত স্থান নিশ্চয়ই কলেজ নয়, ফলে সে লক্ষ্যে কেউ দুই বছর কাটাবে সেটি কি ভাবা যায়? শারিরীক ও মানসিকভাবে সুস্থ এসব ছাত্রদের পরীক্ষায় শতকরা ৬৩ জনের ফেলের অর্থ, শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থা যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি। শিক্ষা হল জাতির মেরুদণ্ড, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা সে মেরুদণ্ডে পঙ্গুত্ব আনে। মেরুদণ্ড গড়বে যে শিক্ষা ব্যবস্থা তার ব্যর্থতার হার যদি ৬৩% হয় তবে সে মেরুদণ্ড কিভাবে নির্মিত হবে? ফেল দূরে থাক, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে পাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিল্পোন্নত দেশের নেতারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বৃটিশ সরকার এমন বহু স্কুলকে বন্ধ করে দিছে। অর্থনীতিকে সবল করার বদলে যে শিল্প রক্তক্ষরণ ঘটায় সেটি চালু রাখার অর্থ জাতিকে আরও দুর্বল করা। তেমনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। উন্নত প্রযুক্তি দূরে থাক, পরীক্ষায় নকল যে চুরিকর্ম সে মৌলিক জ্ঞানটুকু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের শেখাতে পারেনি। নইলে নকলে উৎসব হয় কি করে? ছাত্রদের কতটা বিবেকশূন্য করা হয়েছে এটি তারই আলামত। এভাবে বিবেকশূন্য করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাতে জাতির কল্যাণ আছে কি? এমন বিবেকশূন্যতায় শুধু নকল নয়, সন্ত্রাস, খুন এবং ব্যভিচারও উৎসব যোগ্য মনে হয়। বাংলাদেশে কি সেটিই হয়নি?

জাতি আগামীতে কোন দিকে যাবে সেটি শিক্ষার মানই বলে দেয়। ভিক্ষুকের বাল্যকাল যে জ্ঞানার্জনে কাটেনি সেটি তার ভিক্ষাবৃত্তিই বলে দেয়। তেমনি অবস্থা ভিক্ষুক জাতিরও। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষাদানে একটি জাতি কতটা সজাগ তা দেখেই বলা যায় সে জাতি কতটা আত্মমর্যাদাশীল। বৃটেনের স্কুলে কোন শিশু উচ্চারণে, শ্রবণে বা পাঠগ্রহণে পিছিয়ে পড়লে তাকে সামনে এগিয়ে নিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, শিক্ষক, সমাজকর্মী বা মনবিজ্ঞানী লেগে যায়। এটি তখন শুধু পিতামাতার নয়, জাতীয় দায়িত্বে পরিণত হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বেড়ে ওঠাকে এ জাতি যে কতটা গুরুত্ব দেয় এটি হল তারই প্রমাণ। শুধু এরা সর্বাধিক খবরদারি করে লেখাপড়ার মানের ওপর। কারণ, কারখানার পণ্যের মানের অবনতিতে দুর্বল হয় অর্থনীতি, কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার মানের অবনতিতে দুর্বল হয় সমগ্র জাতি। বৃটেন, জার্মান, জাপান এসব শিল্পোন্নত দেশে একজন্যই শিক্ষকদের ফাঁকি, দেয়ার সুযোগ নেই। এসব দেশের শিক্ষকদের কাছে অতিশয় ভীতিকর হল শিক্ষা পরিদর্শকের ভিজিট। স্কুলের দরজায় তারা যেমন তালা লাগাতে পারে, তেমনি অযোগ্য শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্তও করতে পারে। অথচ আমাদের দেশের এটি সবচেয়ে সন্ত্রাসকবলিত খাত। নিরস্ত্র পরিদর্শক দূরে থাক, অস্ত্রধারী পুলিশও সেখানে অসহায়। কৃষকের গ্রামে বা শ্রমিকের বস্তিতেও এত সন্ত্রাসী সৃষ্টি হয় না, যা সৃষ্টি হয় স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে আমাদের নিচে নামাও শেষ হয়নি। জনসংখ্যায় বিশ্বে সপ্তম হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে ১৪৭তম, অর্থাৎ বিশাল জনসংখ্যা আমাদের সামর্থ্য বা মর্যাদা বাড়ায়নি। যারা ফেল করে তাদের কথা বাদ দিলেও যারা পাস করে বা মেধা তালিকায় স্থান পায় তাদের মধ্য থেকেই বা ক'জন দেশের শিল্প, ব্যাংকিং, প্রশাসন, পুলিশ ও রাজনীতিতে মেধার স্বাক্ষর রেখেছে? আজীবন যারা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে তারাও যে কতটা অযোগ্য ও ক্ষতিকর সে প্রমাণই কি কম? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ পরীক্ষায় প্রতি বছর ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে যারা বের হয় তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার। এরূপ বেরুচ্ছে প্রতি বছরই। দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিতো তারাই, চাকরি লাভের ক্ষেত্রে তাদেরই তো মনোপলি। আজঅবধি কোন প্রতিষ্ঠানে কি ফেল করা ছাত্রকে বসানো হয়েছে? কিন্তু সুফল কৈ? জাপান, বৃটেন বা কোরিয়ায় যখন অর্থনৈতিক বিপ্লব শুরু হয় তখন সে দেশগুলোতে এত ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ছাত্র ছিল না। যত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় আজ বাংলাদেশে তাদের তাও ছিল না। অথচ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বাড়লেও দিন দিন আমরা পিছিয়েই চলেছি। তিরিশ বছর আগে যে অবস্থানে ছিলাম তা থেকেও আজ পিছনে। ১৯৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে আমরা একই স্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। পাকিস্তান আজ আণবিক শক্তিধর, চৌদ্দ কোটি হয়েও ভারতের একশ' কোটি মানুষের সাথে তারা প্রতিযোগিতা দিচ্ছে। শুধু নিজেদের স্বাধীনতার সুরক্ষাই করছে না, প্রতিবেশীদের ভাগ্য নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আফগানিস্তানে রাশিয়ার ভরাডুবি ঘটিয়েছে তারাই। বর্তমানে ভারতকে ডুবাচ্ছে কাশ্মীরে। এখন অস্ত্র ও প্রযুক্তি রফতানী করছে বিদেশে। এক্ষেত্রে তারা যে সফলতা দেখাচ্ছে তাতে সঙ্কিত এমনকি বৃহৎ শক্তিবর্গ। অথচ আমরা নিজেদের ঘরও সামাল দিতে পারছি না। আমাদের স্বাধীনতা আজ শৃঙ্খলিত, সীমান্ত অরক্ষিত। সীমান্ত এলাকার মানুষের জানমাল, ইজ্জত-আবরু, গবাদীপশু ও ক্ষেতখামারের ওপর নিত্যদিন হামলা হচ্ছে প্রতিবেশী বর্গীদের। ছিটমহলগুলোর ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। সার্বভৌমত্ব সীমিত হল পার্বত্য চট্টগ্রামে। অথচ শত্রুরা সেটি '৪৭-এ পারিনি, একাত্তরেও পারেনি। এভাবে আত্মসমর্পণও নিচে নামায় আমরা ইতিহাস গড়ছি সর্বত্র। নিচে নামতে নামতে আমরা নেপাল, ভুটানকেও ছাড়িয়ে গেছি। অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে আমাদের অবস্থান তাদেরও নিচে। অথচ মাত্র কিছুদিন আগেও নেপালে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, ছিল না কোন মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ভুটানে এখনও নেই। বাংলাদেশে যে সংখ্যক মাস্টার্স, গ্রাজুয়েট ও পিএইচডি বিশ্বের ৮০% দেশে তা নেই। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কি কিছু হয়েছে? হয়নি। সমস্যা শুধু ফেল করা ছাত্রদের নিয়ে নয়, বরং সমগ্র শিক্ষিতজন ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে। পরীক্ষার অধিক ফেল রোগের লক্ষণ মাত্র, মূল রোগ আরও গভীরে। ভিতরে ক্যান্সার বাড়লে অবশেষে চর্মেও তার লক্ষণ ধরা পড়ে। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা যে ক্যান্সারগ্রস্ত, পরীক্ষায় ৬৩% ফেল হল সেটিরই আলামত। ফেল করা ছাত্ররা অন্তত, একদিক দিয়ে মঙ্গল করেছে যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ড্রাইভিং-সিটে বসে সর্বনাশা বিপর্যয় ঘটায়নি, যেটি তথাকথিত কৃতী ছাত্ররা করছে। ফেল করা বা স্কুল থেকে ঝরে যাওয়া ছাত্ররা বরং ক্ষেতখামারে গায়ে-গতরে খেটে উৎপাদন খাতে কিছু যোগ করছে। দেশের বৈদেশিক উপার্জনের সবটুকু আসে তাদের বদৌলতেই।

ফসলের স্বপ্ন দেখে যে কৃষক, সে চাষাবাদে মনযোগী হয়। তেমনি যে জাতি উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে সে মনযোগী হয় শিক্ষাখাতে বিনিয়োগে। কিন্তু আমাদের এ খাতটি সম্পূর্ণ অচল। অথচ এটিই বিনিয়োগের সেরা খাত। সোনার খনিতে বিনিয়োগে এত লাভ নেই যে, লাভ মানুষের ওপর বিনিয়োগে। অর্থনীতির ভাষায় বিনিয়োগ হল ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর মূল্য সংযোজন, সে সংযোজিত মূল্যের যোগফলই হল জিডিপি। সোনার ওপর বিনিয়োগে সোনার ভিতরের দিকটায় পরিবর্তন আনে না, সোনার মূল্য বৃদ্ধি তাই নিছক কৃত্রিম। অথচ ব্যক্তির ওপর বিনিয়োগে গুণগত পরিবর্তন আসে তার সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে। বৃদ্ধি পায় তার সম্পদ সৃষ্টির সামর্থ্য। ফলে বিস্ময়কর পরিবর্তন আসে সমাজে। বিশ্বের সকল প্রাচুর্য, শক্তি ও মর্যাদার মূল উৎস্য এই মানব সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ বরং হাজার হাজার বছর পূর্বে আজকের চেয়ে বেশী ছিল, কিন্তু তখন উচ্চতর সভ্যতা নির্মিত হয়নি। মরুর নিঃস্ব আরবরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল এ খাতে বিনিয়োগের কারণেই। যুদ্ধপ্রিয় মানুষগুলো তখন সৃষ্টিশীল সুন্দর মানুষে পরিণত হয়েছিল। স্রষ্টার এ সেরা সৃষ্টিকে সুন্দরতম করাই হল ইসলামের মূল লক্ষ্য। ইসলাম এ লক্ষ্যে বিদ্যা শিক্ষাকে ইবাদতে পরিণত করেছিল। জনশক্তির অবিরাম উন্নয়ন নিয়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে উপলব্ধি তার কারণ, মানবোন্নয়ন ছাড়া কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়। আর বাংলাদেশে এটিই অবহেলিত খাত, পচন ধরেছে এর সর্বত্র জুড়ে। একারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ উৎসব হয়। ছাত্ররা ছুটে চলেছে ড্রাগ, সন্ত্রাস ও মস্তানির দিকে। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের সর্বাধিক বরাদ্দ পায় শিক্ষাখাত। ফেলের হার ৬৩% হওয়ার অর্থ- দেশের লাখ লাখ ছাত্র কলেজগুলোতে ২টি বছর কাটিয়েছে তেমন কিছু না শিখেই। অথচ ছাত্রদের মাঝে গুণগত পরিবর্তন আনাই ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। এক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায়ভার সবটুকু শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থার। শিক্ষকগণের অপরাধ, তারা দায়িত্ব পালন না করে ছাত্রদের জীবন থেকে অহেতুক দু'টি বছর খসিয়ে নিয়েছেন। আর এটি কি কম ডাকাতি? তাদের হাতে জিম্মি শুধু ছাত্রদের ভবিষ্যতই নয়, জাতির ভবিষ্যৎও। দরিদ্র পিতা-মাতা তার সন্তানটিকে বড় আশা করে কলেজে পাঠিয়ে ভেবেছিল তার সন্তান উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা পাবে। ডাকাতের হামলাতেও গরীবের এতটা ক্ষতি হয় না যা হল বিদ্যা শিক্ষার নামে। এতে গরীব পিতামাতার অর্থই শুধু লুট হয়নি, লুট হয়েছে তার সন্তানের মেধা এবং সময়। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থা এভাবে দেশবাসীর অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি ঘটাল তার বিচার কি বাঞ্ছনীয় নয়? প্রতিটি ছাত্রের জীবন থেকে দু'বছর অপচয় হলে জাতীয় জীবনে ক্ষতি হয় কয়েক লাখ বছরের। তবে যারা পাস করেছে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পর্ব এখনও শেষ হয়নি। এদের প্রত্যেকের জীবন থেকে দু-তিন বছর খসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটে। নিছক অর্থের মাপে কি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করা যায়?

কথা হল, শিক্ষা ব্যবস্থার এহেন ব্যর্থতার জন্য জনগণ কাকে জিজ্ঞেস করবে? প্রধানমন্ত্রী কথিত পিএইচডি সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত, তার দলীয় কর্মীরা ব্যস্ত বিরোধী দল নির্মূল নিয়ে। কেউ কেউ ব্যস্ত এক খুনের বদলে দশ খুনের রাজনীতিতে। অর্থ লুটতরাজের পাশাপাশি ছাত্রদের জীবন থেকে যে দু'টি বছর ডাকাতি হল সে দিকে কারুরই ভ্রূক্ষেপই নেই। ইউরোপের কোন দেশে ৬৩% প্রাগ ফেলের এ ভয়ঙ্কর খবরে দেশজুড়ে তোলপাড় হয়ে যেত। এতে শিক্ষামন্ত্রীসহ বহু কর্মকর্তা, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকের চাকরি চলে যেত। কিন্তু বাংলাদেশে এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য নেই। যেন না কিছু হয়েছে, না কেউ কিছু শুনেছে। মুমূর্ষু রোগীর প্রাণফাটা আহাজারিতে যে বস্তিতে সাড়া জাগে না সে লোকালয়ে মৃত্যুই অহরহ হয়। বাংলাদেশ যেন তেমনি এক বিবেকের মৃত্যুপুরী।